খোরাসান থেকে প্রকাশিত
বিশ্বব্যাপী জিহাদের প্রতি আহ্বানকারী ম্যাগাজিন 'হিত্তিন, ইস্যু- ২' এর প্রবন্ধ অনুবাদ

জিহাদী আন্দোলনের চ্যালেঞ্জ ও বিপদাপদ

মাওলানা মাহমুদ হাসান
হাফিযাহুল্লাহ

النصر
AN-NASR

জিহাদী আন্দোলনের চ্যালেঞ্জ ও বিপদাপদ

মাওলানা মাহমুদ হাসান হাফিযাহুল্লাহ

সূচিপত্র

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد.

একুশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক তার শেষলগ্ন অতিক্রম করছে। পৃথিবীর যেখানেই বৈশ্বিকভাবে নানামাত্রিক পরিবর্তন দৃষ্টিগোচর হয়, সেখানেই জিহাদী আন্দোলনসমূহের মাঝে নতুন নতুন অবস্থা ও চ্যালেঞ্জ পরিলক্ষিত হয়। বৈশ্বিক শক্তিধর দেশগুলোর অবস্থা আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় নয়। আমাদের আজকের আলোচনা - মুজাহিদদের অবস্থা ও তাদের বিপদসঙ্কুলতা বিষয়ে।

দুশমনের কূটচাল বুঝতে পারা এবং মুজাহিদিনের অবস্থাদি নিরীক্ষণ করা আবশ্যক

আল্লাহর অশেষ রহমতে বর্তমানে সারাবিশ্বের বেশকিছু দেশে রাজনৈতিক ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ মুক্তভাবে জিহাদী শক্তি মজুদ রয়েছে। তারা নিজ নিজ দেশে যথেষ্ট শক্তিশালী। এটা তো যুদ্ধের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য যে, কখনো এক পক্ষের পাল্লা ভারী হয়, আবার কখনো অপর পক্ষের পাল্লা ভারী হয়। কখনো একদল বিজয়ী হয় তো আবার কখনো অপর দলের বিজয়মালা গলায় উঠে। তবে এমনটা হয়ে থাকে যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায়। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে চূড়ান্তভাবে একপক্ষ অপর পক্ষকে পরাজিত করে এবং তাদের কোমর ভেঙ্গে দিয়ে সকল শক্তি ধ্বংস করে দেয়। এজন্য যুদ্ধের ময়দানে পিছিয়ে পড়া ও দুর্বলতার কারণ খতিয়ে দেখা, (শত্রুপক্ষের) কার্যকরী দুর্বলতার জায়গা তালাশ করা এবং সেসব জায়গাতে তীব্র আঘাত হানা - যুদ্ধে পরিপূর্ণ বিজয় ও সহায়তার জন্য খুবই আবশ্যক।

আমাদের শত্রু বৈশ্বিক শক্তিধর দেশসমূহ ও তাদের দোসররা একজোট। বৈষয়িক ক্ষেত্রে যদিও তাদের মতানৈক্য রয়েছে তবে উম্মতে মুসলিমা ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে তারা সবাই এক। যাকে তারা নাম দিয়েছে 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'। এই যুদ্ধে তাদের কৌশলে সাদৃশ্যতা পাওয়া যায়। এই ক্ষমতাধরেরা নিজেরা পরীক্ষা নিরীক্ষা চালায় এবং যখন কোন একটি পরীক্ষা কোথাও সফলতা লাভ করে, তখন সেই ফর্মুলা অন্যত্রও প্রয়োগ করে থাকে। এই ভিত্তিতে কোন ভূখণ্ডে সেই শক্তিধরদের কৌশল অনুধাবন করা, স্বয়ং সেই ভূমিতে জিহাদী আন্দোলন সফল হওয়ার জন্য অন্যতম শর্ত। এর মাঝে অন্যান্য অঞ্চলের জিহাদী আন্দোলনসমূহের জন্যও শিক্ষণীয় উপাদান রয়েছে।

শামের জিহাদের বিশ্লেষণ

বর্তমান সময়ে সারাবিশ্বের জিহাদী ময়দানসমূহের মাঝে অন্যতম বড় রণাঙ্গন হচ্ছে 'শাম' তথা সিরিয়া। ২০১১ সালে বাশার আল আসাদের বিরুদ্ধে সেখানে জিহাদ শুরু হয়। শামের মুসলমানগণ বাশার আল আসাদের নির্যাতন-নিপীড়ন ও কুফুরি শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ান। এমনকি অন্যান্য অঞ্চল থেকেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মুজাহিদ সেখানে পৌঁছে যান। যার মধ্যে ইরাক ও আফগানিস্তান সবিশেষ উল্লেখ্য। এভাবে সর্বসাধারণের সাহায্য-সমর্থনের দ্বারা সেখানে জিহাদী আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং ২০১৪ সাল নাগাদ রাজধানী দামেস্কের পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলো পর্যন্ত মুজাহিদদের দখলে চলে আসে।

কিন্তু এরপর থেকে পতন শুরু হয় এবং অবস্থা এখন এই দাঁড়িয়েছে যে, পুরো সিরিয়ার মধ্য থেকে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় 'ইদলিব' এলাকাটিই কেবল মুজাহিদদের দখলে রয়েছে। প্রাকৃতিক কার্যকারণের সাথে সাথে অনেক ভূ-তাত্ত্বিক বিষয়াদি রয়েছে, যা শামের জিহাদের দৃষ্টিতে অনুধাবন করা জরুরী। যাতে করে সেসবের মূলোৎপাটন ও তা সংশোধনে মনোনিবেশ করা যায় এবং যে ক্ষতি সেসবের দ্বারা হয়েছে, তা শুরুতেই দূরীভূত করার জন্য চেষ্টা করা যায়।

শামের জিহাদে দুর্বলতার কারণ

চিন্তা-ভাবনা করলে যেটা বুঝে আসে, শামের জিহাদের দুর্বলতার প্রধানত: চারটি মৌলিক কারণ বিদ্যমান। নিচে তা আলোচনা করা হলো:

১. অনৈক্য (মুজাহিদদের মাঝে পরস্পর একতা না থাকা)

প্রথম মৌলিক কারণ, যার ফলে শামের জিহাদে দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছে, তা হচ্ছে মুজাহিদদের পরস্পর অনৈক্য। শামে যখন জিহাদ শুরু হয়, তখন একাধিক জিহাদী গ্রুপ ও দল তৈরি হয়ে যায় এবং তারা নিজেরা নিজেদের জন্য জিহাদ শুরু করে দেয়। ধীরে ধীরে তারা নিজ নিজ (দখলকৃত) জায়গায় শক্তির কেন্দ্রে পরিণত হতে থাকে এবং একতাবদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে যার যার পরিচিতি তুলে ধরায় মনোনিবেশ করে। ফলশ্রুতিতে মতবিরোধের দরজা খুলে যায়। লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে মতভিন্নতা সৃষ্টি হয়, কৌশল প্রণয়নেও মতানৈক্য দেখা দেয়। এরপর কার্যক্ষেত্রেও দেখা গেল, বিরোধ-বিতর্ক শুরু হলো। আর এই এখতেলাফ ও দ্বন্দ্ব-বিরোধের ফলে

মুজাহিদদের মাঝে দৃঢ়তা টলে গেল। তাদের মধ্যকার এই পারস্পরিক সাহায্য-সহমর্মিতার অভাবে শত্রুপক্ষ ফায়দা নিয়েছে পুরোপুরিভাবে।

দুর্ভোগ এতোটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং এই সকল গ্রুপ ও দল নিজেরা পরস্পর রাজনৈতিকভাবে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করতে থাকে। যেই এলাকায় যেই গ্রুপের শক্তিমত্তা বেশি ছিল, তারা ঐ এলাকা থেকে অন্যান্য গ্রুপের লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের থেকে দখলমুক্ত করে সেখানে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে নেয়। জাইশুল ইসলাম গুতা'য় এমনটা করেছে। জাবহাত ফাতেহ শাম (পরবর্তীতে হাইআত তাহরীরুশ শাম) ও আহরার আশ-শাম - ইদলিব এবং পশ্চিম হালব-এ একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে যায়। তাদের এই পারস্পরিক যুদ্ধ তাগুতী শক্তিগুলোর সামনে মুজাহিদিনের অনৈক্যকেই ফুটিয়ে তুলেছে করুণভাবে। এর ফলে তারা জিহাদকে বানচাল করার জন্য আরো বেশি করে ইন্ধন যোগাতে সুযোগ পেয়েছে।

২. বৈশ্বিক জিহাদ থেকে আঞ্চলিক জিহাদে রূপান্তর

শামে যখন জিহাদ শুরু হয়, সারাবিশ্বের মুসলমান এসে তাতে অংশগ্রহণ করেছেন। উম্মতে মুসলিমাহ এটাকে নিজেদের সমস্যা বলেই মনে করেছেন। এই রণাঙ্গন ছিল সব মুসলমানের রণাঙ্গন। কেননা, মুসলমান হলো একটি জাতির ন্যায়, এক দেহ-এক প্রাণ। কোন একটি ভূখণ্ডের কোন একজন মুসলমান যখন বিপদে পতিত হয়, তখন অপরাপর ভূখণ্ডের মুসলমানেরাও তার চিন্তায় চিন্তিত হয়। একটি অঞ্চলে যখন কোন মুসলমান নির্যাতিত হয়, তখন পুরো উম্মাহ তাকে সহযোগিতা করাকে নিজেদের ওপর ফরজ মনে করে। এমনিভাবে শামের জিহাদেও পুরো উম্মাহর নওজোয়ান, পুরুষ-নারীগণ নিজেদের সব উপায়-উপকরণ অবলম্বন করে সহযোগিতার চেষ্টা করেছেন এবং একে পুরো উম্মাহর বিজয় ও মসজিদে আকসা পুনরুদ্ধারের উপায় ভেবেছেন।

এটা বৈশ্বিক শক্তিধরদের জন্য কোনভাবেই মেনে নেয়ার মতো ছিল না। তারা পূর্ণ চেষ্টা করতে লাগল, যেন শামের মুজাহিদগণ এই যুদ্ধকে পুরো উম্মাহর সংকট হিসেবে না নিয়ে বরং আঞ্চলিক সমস্যা এবং শুধু সিরিয়ার স্বাধীনতার প্রশ্ন মনে করে। বৈশ্বিক শক্তিধরেরা তাদের এই কৌশলে দুই দিক থেকে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। একদিকে শামের জিহাদে উম্মাহর সাহায্য-সহায়তার পথ রুদ্ধ করে, এই

যুদ্ধকে দেশীয় জাতীয়তাবাদের মোড়কে আবদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়। অপর দিকে শামের জিহাদকে পুরো উম্মাহর ‘পুনরুত্থানের কারণ’ হওয়া থেকে বিরত রাখা প্রচেষ্টা চালানো হয়।

শক্তিধর দেশগুলো এই প্রোপাগান্ডা তাদের এজেন্ট দ্বারা এতো জোরেশোরে চালাল যে, শামের অধিকাংশ মুজাহিদিন গ্রুপ শুধু যে তাদের কথায় প্রভাবিত হলো তাই নয়, বরং তারা নিজেরা স্বয়ং একথা নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে প্রচার করতে শুরু করে দিল। এরই প্রভাবে আল-কায়েদার সাথে সম্পর্ক রাখা গ্রুপ জাবহাতুন নুসরাহ আল-কায়েদার সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করল এবং আল-কায়েদার সাথে যাবতীয় সম্পৃক্ততা মুছে ফেলার প্রচেষ্টা করতে লাগল। কারণ, তারা (আল-কায়েদা) পুরো উম্মাহর পুনরুত্থান ও প্রতিরোধের প্রবক্তা!

৩. তাগুতী হুকুমতের সাথে পারস্পরিক সহায়তা

দুর্বলতার তৃতীয় কারণ, শামের জিহাদী গ্রুপগুলো মুসলিম দেশসমূহে চেপে থাকা বিভিন্ন তাগুতী প্রশাসনের সাথে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা এই পরিমাণ বৃদ্ধি করেছে যে, সেসব প্রশাসনের প্রভাব খোদ তাদের সিদ্ধান্তের ওপর এসে পড়েছে। তুরস্ক, সৌদি ও কাতার সেসব দেশসমূহের অন্যতম, যারা শামের বিভিন্ন জিহাদী গ্রুপের সাথে সরাসরি সহায়তার সম্পর্ক স্থাপন করেছে। অর্থ, অস্ত্র ও এমনকি নিজেদের লোক পর্যন্ত তারা মুজাহিদদের মাঝে সরবরাহ করেছে!

এর ফলশ্রুতিতে সেসকল তাগুতী প্রশাসন শুধু যে নিজেদের স্বার্থদ্ধার করেছে তাই নয়, বরং সবচেয়ে বড় ক্ষতি তারা এই করেছে যে - মুজাহিদদেরকে বৈশ্বিক শক্তিধরদের সাথে আলোচনা ও বোঝাপড়া করতে বাধ্য করেছে। বৈশ্বিক শক্তিধরদের পাতা টেবিলে তাদেরকে এনে বসিয়েছে, তাদেরকে আন্তর্জাতিক নিয়ম-কানুনের অনুগত করে ফেলেছে। ‘জিহাদ’কেও আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে সংগঠিত যুদ্ধে পরিবর্তন করে দিয়েছে। কাজাখাস্তানের আস্তানায় অনুষ্ঠিত ধারাবাহিক আলাপ-আলোচনা ও এর ফলাফল একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

আমরা এখানে শরিয়তের এই মাসআলা নিয়ে আলোচনা করছি না যে, কুফফারদের সাহায্য-সহযোগিতা গ্রহণ জায়েজ কিনা। এই বিষয়টি মুজাহিদিনদের মাঝে পরিচিত এবং এবিষয়ে মুজাহিদ উলামায়ে কেরামের বিভিন্ন কিতাব রয়েছে।

আলোচ্য মাসআলাটি - আফগানিস্তানে রুশ দখলদারিত্বের সময় থেকেই আলোচিত হচ্ছে এবং শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ-ও এ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

এটি জায়েজ হওয়ার বিষয়ে উলামায়ে কেরাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন। তবে এটাও তো লক্ষ্য রাখতে হবে যে, জায়েজ হওয়ার বিষয়টি যেই শর্তের সাথে সম্পর্কিত অর্থাৎ, 'ইসলামের কালিমা সমুন্নত হওয়ার প্রবল ধারণা' তা বর্তমানে কুফফারদের সহায়তা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোথায় সম্ভব হতে পারে, তা স্পষ্টতই দৃশ্যমান। যেখানে মুজাহিদদের মাঝে ঐক্য নেই, পরস্পরের মাঝে একতা নেই, তারা উম্মাহকে নিজেদের পৃষ্ঠপোষক বানাতে ব্যর্থ হয়েছে - সেখানে তারা যদি তাগুতী প্রশাসনের সহায়তার ভিত্তিতে জিহাদী কার্যক্রম পরিচালনা করে, তবে এমনতর জিহাদের সফলতার আশা করা, নির্বুদ্ধিতারই নামান্তর।

৪. লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুতি

জিহাদী কার্যক্রমে দুর্বলতার চতুর্থ কারণ মূলতঃ উপরোক্ত তিন কারণের চূড়ান্ত পরিণতি। সেটা হচ্ছে, মুজাহিদদের অধিকাংশ গ্রুপই বিশ্বশক্তি ও তাগুতী প্রশাসনের নির্ধারণকৃত পদ্ধতিতে জিহাদ করাকে কবুল করে নিয়েছে। আন্তর্জাতিক যুদ্ধনীতিকে মেনে নিয়েছে, জাতিগত যুদ্ধকে মেনে নিয়েছে এবং শাসনব্যবস্থায় শরিয়ত প্রতিষ্ঠার নীতি থেকে সরে এসেছে। এভাবেই কিছু গ্রুপ মৌলিক ও নীতিগত দৃষ্টিকোণ পরিবর্তন করে ফেলেছে। অথচ এসকল মুজাহিদিন যখন বাশার আল আসাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছিল, তখন তাকে তাগুত আখ্যায়িত করে শরয়ী জিহাদ শুরু করেছিল এবং তাকে হটিয়ে 'ইসলামী ইমারত' প্রতিষ্ঠা ও শরীয়তের বিধান কার্যকর করাকে নিজেদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য স্থির করেছিল।

প্রমাণস্বরূপ এই উদাহরণ দেওয়া যায় যে, জাহরান আলুশ রহিমাহুল্লাহ যিনি 'জাইশুল ইসলাম'-এর প্রধান ছিলেন এবং একসময় শামের জিহাদের সবচেয়ে বড় জোট 'আল-জাবহাতুল ইসলামিয়া'- এর সৈনিকদের দায়িত্বশীল ছিলেন, তিনি শুরুতে এই মূলনীতির ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, তারা শামকে শিয়া নুসাইরীদের কাছ থেকে পবিত্র করবেন এবং গণতন্ত্রের পরিবর্তে এই ভূখণ্ডে ইসলামী ইমারত প্রতিষ্ঠা করবেন। কিন্তু ২০১৫ সালে প্রকাশনা সংস্থা ম্যাক ক্লাসি-এর সাংবাদিককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "এটি একান্তই সিরিয়ার জনগণের ব্যাপার যে,

তারা কোন পদ্ধতির শাসনব্যবস্থা কায়েম করবে (অর্থাৎ, ইসলাম নাকি গণতন্ত্র)”। একথাও তিনি বলেন যে, “শিয়া নুসাইরীরাও শামের জনসাধারণের অংশ”। তার অনুবাদক একথাও ব্যাখ্যা করে দেন যে, প্রথমে বয়ান-বিবৃতিতে কঠোরতা প্রদর্শনের কারণ ছিল, যুবকদেরকে আশ্বস্ত করা ও তাদের দ্বারা সহযোগিতা নেওয়া।

এটি একটি মাত্র উদাহরণ। শামের অধিকাংশ গ্রুপই বর্তমানের গণতন্ত্রের প্রতি নমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করছে এবং বৈশ্বিক শক্তিধরদের এই সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়েছে যে, যুদ্ধ বন্ধ করে জাতিসংঘের ও আন্তর্জাতিক মহলের অধীনে একটি নতুন সরকার গঠনের ব্যাপারে অংশগ্রহণ করা হবে।

উপরোক্ত চার কার্যকারণের ফলে শামের জিহাদী আন্দোলনের অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তা আজ সবার সামনেই দৃশ্যমান।

আন্তর্জাতিক মহলের দুরভিসন্ধি

শামের জিহাদী গ্রুপগুলোর বর্তমান অবস্থার বিশ্লেষণ থেকে বৈশ্বিক শক্তিধর দেশসমূহের অভিপ্রায় কি, তা স্পষ্টতই সামনে ভেসে ওঠে। তাদের এই অভিসন্ধি তারা সারাবিশ্বে বিদ্যমান প্রত্যেকটি জিহাদী আন্দোলন সংগ্রামেই প্রয়োগ করার চেষ্টা করে আসছে। তাদের এই কর্মপন্থার তিনটি দিক রয়েছে। যথা:

১. জাতীয়করণ

যে কোন দেশে জিহাদী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠলে, তাকে পুরো মুসলিম উম্মাহর মুআমালা হওয়া থেকে বিরত রাখা। মুসলিম উম্মাহকে এই আন্দোলনে সহায়তার হাত প্রসারিত করা থেকে বাধা প্রদান করা। সারাবিশ্বের মুসলমানদেরকে এতে অংশগ্রহণে বিরত রাখা, যেসকল মুহাজিরীন হিজরত করে চলে এসেছে, তাদেরকে একঘরে করে রাখা। সেইসাথে আল-কায়েদার নামে জুজুর ভয় দেখানো। এভাবে এই আন্দোলনকে সকল মুসলমানের একক শক্তি হওয়ার পথ রুদ্ধ করে দেওয়া।

২. তাগুতী প্রশাসনকে জিহাদে অন্তর্ভুক্তকরণ

যে কোন ভূখণ্ডে স্বাধীন জিহাদী আন্দোলনের সূচনা হলে, অন্যান্য মুসলিম দেশসমূহের তাগুতী প্রশাসনকে (যারা মূলতঃ বৈশ্বিক শক্তিধরদেরই দাবার ঘুটি)

এই জিহাদে শরীক করা এবং তাদের মাধ্যমে এই আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টা চালানো।

৩. জিহাদকে শরয়ী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া

যে কোন অঞ্চলে আযাদ জিহাদী তৎপরতার সূত্রপাত হলে, সেটাকে নিজেদের বা অন্য কারো সহায়তায় - কখনোবা সহায়তা প্রদানের ছলে, কখনোবা সহায়তা বন্ধের চাপ প্রয়োগ করে শরীয়তের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তথা দ্বীন ও শরীয়তের শাসনকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা থেকে হটিয়ে তাদেরকে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনার অনুগত করে ফেলার চেষ্টা করা। জিহাদকে আন্তর্জাতিক নিয়মকানুনের বাধ্যগত যুদ্ধে পরিণত করার চেষ্টা করা। জাতিসংঘের মূল্যবোধে বিশ্বাসী করে তোলা এবং গণতান্ত্রিক শক্তির ভিত্তিতে হুকুমত কায়েম করার প্রতি বাধ্য করা।

নিজেদের মূলনীতির ওপর অটল-অবিচলতা ভেস্তে গেছে

এসব সেই অভিপ্রায়, যার ওপর বৈশ্বিক শক্তিধর দেশগুলো কাজ করে যাচ্ছে। শামের জিহাদকে তারা এই দুরভিসন্ধি নিয়েই নিয়ন্ত্রণ করেছে। এখন অন্যান্য ভূখণ্ডেও তারা এই কৌশল প্রয়োগ করতে তৎপর রয়েছে। পাকিস্তানের জিহাদে তারা এই অস্ত্রই প্রয়োগ করে যাচ্ছে এবং পাকিস্তানের জিহাদের দুর্বলতার কারণ তাই, যা শামের জিহাদের ব্যাপারে উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। বর্তমানে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের ওপরও এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ চাপ প্রয়োগের চেষ্টা চলছে যে, তারা যেন (বিশ্বের নানা প্রান্ত হতে আফগানিস্তানে আগত) মুহাজিরীনদের পৃষ্ঠপোষকতা পরিত্যাগ করে এবং রাজনৈতিক পন্থায় শামিল হয়ে যায়; তাহলেই তাদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করা হবে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আমীরুল মুমিনীন শাইখ হিবাতুল্লাহ আখুন্দযাদাহকে নিজ নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে রাখুন। তাঁর নেতৃত্বেই ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান আজ অবধি দৃঢ়তা ও অবিচলতার সাথে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। উল্টো কুফফারদেরকেই প্রত্যেক দিন নতুন করে চিন্তাভাবনা করতে বাধ্য করেছে। সারা দুনিয়ার মুজাহিদিনের জন্য ইমারতে ইসলামিয়ার মাঝে শিক্ষণীয় উপাদান রয়েছে যে, কীভাবে তারা বিশ্বশক্তির সাথে রাজনৈতিক অঙ্গনে

যুদ্ধের ময়দান কায়েম করে বিজয় লাভ করেছে। বস্তুতঃ এর বুনিয়াদী কারণ হচ্ছে, মৌলিক নীতিতে তাদের অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস এবং পর্বতসম অটলতা ও অনমনীয়তা।

তারা তাদের মূল লক্ষ্যস্থল থেকে দূরে সরে যাননি। শরিয়ত প্রতিষ্ঠার ধ্বনি আজও তাদের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়। সারাবিশ্বের মুসলমানের সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে আসা, মুসলিমদের আশা-ভরসার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হওয়া আজও তাদের অন্যতম আকাঙ্ক্ষা। তাদের যুদ্ধ শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত জিহাদ ও কিতালের যাবতীয় বিধানাবলীর অনুগত। এরই ফলশ্রুতিতে দেখা যায়, বিশ্বশক্তি ও তাগুতী প্রশাসনের সাথে আলাপ-সংলাপে তাঁদের হাতই উঁচু থাকে আর দ্বীন-শরিয়ত ও উম্মাহর দুশমনেরা হয় লাঞ্ছিত ও ক্ষতিগ্রস্ত। তাসত্ত্বেও যদি দ্বীনের মৌলিক বিধানের ওপর অবিচল থাকার ব্যাপারে কোনরকম অসতর্কতা চলে আসে, তাহলে আল্লাহর পানাহ এই মর্যাদাও ছিনিয়ে নেওয়া হতে পারে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইমারতে ইসলামিয়াকে সারাবিশ্বের মুসলমানদের জন্য শীতল ছায়া বানিয়ে দিন। সারাবিশ্বের মুজাহিদিনের জন্য উত্তম আদর্শ ও নির্ভরতার প্রতীক করে দিন। আমীরুল মুমিনীনের ছায়া আমাদের ওপর দীর্ঘায়িত করুন। আমীন।

وأخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

****